নবম অধ্যায়

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উনিশশতকের পৌরাণিক নাটকের অহৈতুকী ভক্তিকে অতিক্রম করে বিশশতকে যুক্তিবাদের অন্বেষণ করেছেন যেসকল নাট্যকার তাদের মধ্যে অন্যতম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রবীন্দ্রনাথের মহাভারত আশ্রয়ী নাট্যকাব্যগুলি ছাড়াও গৈরিশযুগের পর ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অপরেশচন্দ্রের নাটকে পৌরাণিক চরিত্রগুলির রূপায়ণে বহুমাত্রিক প্রয়াস লক্ষণীয়। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি যে অর্থে পৌরাণিক অভিধেয় পরবর্তী কালের নাটকে ঠিক সেই তাৎপর্য অক্ষুন্ন থাকেনি। নাট্যকাররা পুরাণ বা মহাকাব্যকে আশ্রয় করে নাটক রচনা করলেও তাঁদের নাটকে ভক্তিরসের ভাবাবেগ লঙ্ঘিত হয়েছে বা কোথাও কোথাও কৃত্রিম রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) :

পৌরাণিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের পরই বাংলা নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান। কবিত্বশক্তি, দার্শনিকতা ও ভক্তিপ্রণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর নাটকগুলি সমকালীন দর্শকের মন জয় করেছিল। তাঁর অধিকাংশ নাটক রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক বিষয়কে ভিত্তি করে রচিত হলেও পৌরাণিক নাটকগুলি মহাকাব্যিক চরিত্রের বিবর্তনের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যসমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদের মনন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন -

> ''গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদের অধ্যাত্ম-বিশ্বাস প্রবল ছিল। এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভাব ছিল স্বতন্ত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম তান্ত্রিক বংশে, তিনি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'অলৌকিক রহস্য' নামক পত্রিকা বার হত। দৈবশক্তির উপর এই প্রবল বিশ্বাস তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির উপর ছায়াপাত করেছে। . . . পৌরাণিক ঘটনা, চরিত্র এবং রসকে তিনি পুরাণের ভাবগম্ভীর পরিবেশেই মূর্ত করেছেন।''[১]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেমন শ্রী রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি শ্রীমা সারদা দেবীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যচেতনাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর নাটকে অতিমাত্রায় আদর্শবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলা নাটকের এই ধারায় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ক্ষীরোদপ্রসাদের যে স্থান চিহ্নিত করেছেন-

> ''একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগরক্ষাকারী বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারা যায়। মধ্যযুগের পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার ধারাটি যেমন তিনি আধুনিক যুগ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনি আধুনিক যুগের আত্মসচেতনতা দ্বারাও তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিলেন।''[২]

মহাভারতের প্রতি ক্ষীরোদপ্রসাদের অপরিসীম আগ্রহের প্রতিফলন তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেখা যায়। তিনি মহাকাব্যের পাঁচটি চরিত্র নিয়ে নাটক রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর পুত্র সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে জানিয়েছেন -

> ''নাট্যকার মহাভারত হইতে পাঁচটি চরিত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন ও ঐ পাঁচটি চরিত্রের নাটকীয় ব্যক্তিত্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের উপর কেন্দ্র করিয়া নিজের মনোমত নাটক লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। চরিত্রগুলি এই :- ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও কৃষ্ণ। ১৯১২/১৩ সালে কাশীধামে তিনি 'ভীষ্ম' নাটক লেখা শেষ করেন, এবং তাহা নাট্যামোদিগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাহার পর তিনি 'দ্রোণ' ও 'কৃপ' লেখা আরম্ভ করেন।''[৩]

পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ মূলত মহাভারত থেকেই চরিত্র নির্বাচন করেছেন। তিনি 'বভ্রুবাহন'(১৯০০),, 'সাবিত্রী'(১৯০২), 'উলুপী'(১৯০৬), 'ভীষ্ম'(১৯১৩) ইত্যাদি নাটকের মধ্যে যে পুরাণ দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, জীবনের অন্তিম পর্বে 'নরনারায়ণ'(১৯২৬) নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হন। নাটকগুলির বিশ্লেষণে মহাভারতীয় চরিত্রের পুনর্নির্মাণের বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

বভ্রুবাহন (১৯০০) :

মহাভারতের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনি অনুসরণে 'বভ্রুবাহন' নাটকটি রচিত। জৈমিনি ভারতে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ যে বিস্তৃত কলেবর ধারণ করেছে তার অনুরূপ কাহিনি কাশীরামের কাব্যে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পেলেও মূল ঘটনা প্রায় একই থেকেছে। ব্যাস আখ্যানের সুবিশাল পরিধিতে বভ্রুবাহনের কাহিনি ক্ষুদ্রকায় হলেও সকল মহাকাব্যেই বভ্রুবাহন কর্তৃক পিতা অর্জুনের প্রাণ সংশয় ও উলূপীর সঞ্জীবনী মণির প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্তির ঘটনা স্বীকৃত। অলৌকিক ঘটনা সমৃদ্ধ এই কাহিনিকে উপজীব্য করে ক্ষীরোদপ্রসাদ যে নাটক রচনা করলেন তাতে মহাকাব্যিক উপাদানের ব্যবহার লক্ষণীয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের এই নাটকে কাহিনির পরতে পরতে ভক্তিরসের প্লাবনে দর্শক ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছে। নাটকটি সম্পর্কে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা প্রসংশা করেছে-

> ''বুঝিলাম বহুদিনের পর বাঙ্গালায় একখানি নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। . . . কিদৃশ ঘটনায়, কিদৃশ লিপিচাতুর্যে, কিদৃশ চরিত্রচিত্রে এই নাটকের সৌন্দর্যস্রোত উথলিয়া উঠিয়াছে।''[৪]

নাটকের শুরুতে উলূপীপুত্র ইলাবন্ত বা ইরাবানকে দেখা যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রে অষ্টম-দিবসীয় যুদ্ধে কৌরব পক্ষের অলম্বুষ নামে এক রাক্ষসের হাতে তার মৃত্যু ঘটে। কাশীরামে ইরাবানের মৃত্যু ঘটেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চম দিনে -

> ''দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্বল।
> দুষ্ট অলম্বুষ হাসে করি খল খল।।
> খড়গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
> ভূমিতলে পড়ে ইরাবান মহাবীর।।''[৫]

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে যুদ্ধাবসানের পরেও অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্যন্ত ইরাবানকে জীবিত রেখেছেন। ইরাবানকে বভ্রুবাহনের প্রতিনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠার জন্যই নাট্যকার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরও তাকে জীবিত রাখার পরিকল্পনা করেছেন। যজ্ঞাশ্ব রক্ষক রূপে নাগরাজ্যের বিরূদ্ধে যুদ্ধ এবং বভ্রুবাহনের সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধে বৈপরীত্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়।

মহাভারতে উলূপীর পিতাকে কৌরব্য নাগ নামে অভিহিত করা হয়েছে, পৌরাণিক অভিধানেও তাই। জৈমিনি ভারতের নাগরাজ শেষ নাগকে কাশীরাম অনন্ত নাগ নামে উল্লেখ করেছেন। নাটকে বৃদ্ধ অনন্ত নাগ চরিত্রটি যে লৌকিক স্তরে অবস্থান করেছে তার মধ্যে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা না থাকলেও আটপৌর জীবন বোধে কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি। চিত্রাঙ্গদার কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে উলূপী জানিয়েছেন –

''অনন্ত-দুহিতা আমি সুন গো সুন্দরী।
আমা বিভা করি পার্থ গেল মম পুরী।।
অর্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জুনেরে দিল।।''[৬]

মহাভারতে সঞ্জীবনী মণির প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে, অর্জুনের আপাত মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের উপায় স্বরূপ। মহাকাব্যের কবি যেখানে মণির প্রসঙ্গ অপ্রকাশিত রেখে নাটকীয় উৎকণ্ঠাকে জিইয়ে রেখেছেন, সেখানে নাট্যকার প্রথম থেকেই মণির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নারদের হাত দিয়ে মণি এসেছে নাটকে এবং সেই সঙ্গে ভক্তিরস। সঞ্জীবনী মণির এক আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন নাট্যকার যা কেবল একবার মাত্র জীবনদানে সীমাবদ্ধ নয়। 'সে মণি হাতে দেবার নয়। কান দিয়ে প্রবেশ করিয়ে হৃদয়ে গোপনে স্থাপন করতে হয়।'(১/৫) যুগের দাবিতে সমকালীন দর্শক মনে ভক্তিরসের ধারা বইয়ে দিতে নারদের আবির্ভাব। মহাভারতের আখ্যানে নারদ নেই।

বৃদ্ধ নাগরাজ অনন্ত, তার এক চক্ষুকানা ভৃত্য এবং ছদ্মবেশী নারদকে নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির স্থূল প্রয়াস অহেতুক প্রলম্বিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। নারদ প্রদত্ত মণি এবং উলূপী সম্পর্কে অনিবার্য ভবিষ্যবাণী নাগকন্যাকে অনেকটা যান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত করে। একমাত্র দৌহিত্র ইলাবন্তের প্রতি স্নেহাধিক্যে নাগরাজকে যতটা মানবিক করেছে, মাতা উলূপীর ক্ষেত্রে মাতৃত্বকে অতিক্রম করে গেছে অর্জুনের প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য বোধ। স্বামীকে নরক ভোগের পাপ থেকে মুক্ত

করতে নাটকে উলূপী যে সকল কর্মকাণ্ড করেছে তা হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। পরলোকের প্রাধান্য দিতে গিয়ে ইহলোকের আবেগানুভূতি বিসর্জনের ফলে পৌরাণিক মহাকাব্যের ত্রিজগৎব্যাপী অধি-বাস্তবতার সঙ্গে মর্ত-বাস্তবতার সংঘাত বাধে। তাই নাটকে উলূপী চরিত্রটি হয়ে যায় যান্ত্রিক।

উলূপী : নরক ভীষণ, না মরণ ভীষণ?

অনন্ত : মরণকে ভয় করতে হয় এই প্রথম শুনলুম।

উলূপী : আর নরক?

অনন্ত : নাম শুনলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

উলূপী : তবে শোনো পিতা! স্বামীকে নরক হতে নিস্তার দেবার জন্য, তাঁর মরণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেছি।(২/২)

কাশীরামের উপস্থাপনে অলৌকিকতার প্রাচুর্য থাকলেও তাঁর আখ্যানে যথেষ্ট নাটকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। কাশীরাম কাহিনি বয়নে সাসপেন্সকে জিইয়ে রেখেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ ভবিতব্যকে অনিবার্য ধরে মণির রহস্য প্রকাশ করে উলূপীর মনে স্বামী অথবা পুত্র যে কোনো একজনের প্রাণ রক্ষার্থে নারী মনের দোটানাকে রূপদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নাটকের নাম 'বভ্রুবাহন' হলেও আসলে তা উলুপীরই কাহিনি। উলূপী অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বভ্রুবাহনকে উৎসাহিত করেন -

''তোমার পিতা যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমার অধিকার মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন উঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে উনি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।''[৭]

মহাভারতের আদিপর্বে উলূপী অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি প্রেম নিবেদন করেন এবং অর্জুনকে একটি মাত্র রাতের জন্য পেয়েই তৃপ্ত হন-

''একদা অর্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার নিমিত্ত যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন, অমনি নাগরাজদুহিতা

> উলূপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশায় তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। . . . তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগভবন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক উলুপী-সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন।''[৮]

প্রাচীন কালে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশেষত অনার্য রমনী উলূপীর যৌন আবেদনে সংকোচহীন আত্মপ্রকাশে মহাকাব্যের কবির উদারতা বিশশতকের নাট্যকারের কাছে অস্বস্তির। তাই নাটকে অর্জুনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মূহুর্ত নাগরাজ ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেন-

> 'অর্জুন যখন এ রাজ্যে ভ্রমণ করতে এল তোরই সঙ্গে তো প্রথমে দেখা হল। কিন্তু তুই তাকে আদর-অভ্যর্থনা কিছুই না করে পথ হতে বিদেয় করে দিয়েছিলি। সে তোর সম্মূখে দাঁড়িয়ে তোর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, তুই মুখ ফিরিয়ে চলে যাস।'(১/৩)

আবার একটিমাত্র রাতের সম্পর্কও মহাকাব্যের জগতে উপেক্ষিত নয়। নাট্যকার একটি রাত্রিকে এক বছরে বিস্তারিত করে সম্পর্কের বুনিয়াদ গড়েছেন।

নাটকে বভ্রুবাহনকে দেখা যায় অনেক পরে, ১ম অঙ্কের ৬ষ্ঠ দৃশ্যে যখন ইরাবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করতে যাচ্ছেন। কুরুযুদ্ধে ইরাবান আমন্ত্রিত ছিল কিন্তু বভ্রুবাহন পুত্রিকা-সন্তান বলে তিনি যুদ্ধে অনাহুত। বনপর্বে ইরাবান পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে অর্জুন আসন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা বলেন। নাটকে পুন্ডরীক অর্জুনের নির্দেশে কুরুযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সংবাদ বয়ে আনেন। কাশীরামের আখ্যানে পুন্ডরীকের ভূমিকা ভিন্নতর।

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে অশ্বমেধের ঘোড়া সম্পর্কে সুযোগ সন্ধানী সাধারণ ভীরু জনতার বাক্যালাপ হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় কৃষক শূন্যগর্ভ কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে, 'অশ্বমেধের ঘোড়া কিনা! তাই এড়া কাপড়ে ছুঁলুম না। ঘোড়াটা ধরব বলে বাড়িতে কাপড় ছাড়তে গিছি আর অমনি তুমি ধরে ফেলেছ।'(২/৪)

মহাভারতে অর্জুন চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেন নি। জৈমিনি তাঁর আখ্যানে বভ্রুবাহনের জন্ম প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, ''তুমি আমার ঔরসপুত্র নহ। বোধ হইতেছে, চিত্রাঙ্গদা বৈশ্যের ঔরসে তোমাকে প্রসব করিয়াছেন; পাণ্ডবের ঔরসে নহে।''[৯] নাটকে এই প্রসঙ্গ কাশীরাম থেকে আগত। বাস্তবিক কথক ঠাকুরেরা এই জাতীয় প্রসঙ্গের অবকাশ পেলে রসনা নিয়ন্ত্রন করতে পারেন না।

''জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলে মোরে।
যে জন জারজ তাহা বিদিত সংসারে।।
আমার মাতাকে নটী বলিলে আপনি।
কোন কর্ম কৈল কুন্তী তোমার জননী।।''[১০]

নাটকেও অর্জুনের অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, 'জারজকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করার প্রয়োজন নাই।' পদাঘাত করে, 'দূর হও নটির সন্তান।'(২/৫)

মহাভারতে বভ্রুবাহনের যুদ্ধে কৃষ্ণ অনুপস্থিত। জৈমিনি আখ্যানে শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃত, 'ইতিপূর্বে তুমি যেখানে যেখানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বাসুদেবকে স্মরণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য লাভে কৃতকার্য হইয়াছ। অধুনা, তুমি সেই মহাত্মা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছ।''[১১] কাশীরামেও তাঁর আগমন বিলম্বিত -

''গঙ্গার বচন সত্য করিতে মুরারি।
অর্জুনে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি।।''[১২]

নাটকে কৃষ্ণ ভক্তি সত্যভামার উৎকণ্ঠায় ব্যক্ত হয়েছে, 'চেয়ে দেখো যদুবংশের অবশ্যম্ভাবী ভীষণ পতন। তুমি তাদের প্রতি একবারমাত্রও দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ না। ঠাকুর, কে কোথায় বাসুদেব বলে ডেকেছে, তাই তুমি সহধর্মিণীর সেবা পদদলিত করে উন্মাদের মতো ছুটে এলে! ঠাকুর, তোমার আত্ম-পর ভেদজ্ঞান নেই বলে, পরগুলোকে কি এত আপনার করতে হয়?'(৩/৩)

নাটকে বভ্রুবাহনের নিকট অর্জুনের আপাত পরাভব ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তী নাটক 'সাবিত্রী'তেও মৃত্যুকে হাসতে হাসতে উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নাট্যাংশের শেষে ভক্তিরসের প্রাবল্যে শ্রীকৃষ্ণকে বেশি গুরুত্ব দানে নাটকের ভরকেন্দ্র বিচ্যুত হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকে প্রায়শই দেখা যায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাবিত্রী (১৯০২) :

মহাভারতের বনপর্বের সাবিত্রী উপাখ্যান অনুসরনে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'সাবিত্রী' নাটকটি রচনা করেন। ইতিপূর্বে একই বিষয় নিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'সাবিত্রী সত্যবান'(১৮৫৮) নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায় 'পতিব্রতা'(১৮৭৫) নাটকে আদর্শ সতীর যে রূপরেখা তুলে ধরতে চেয়েছেন তাও মহাভারত কাহিনিরই অনুবর্তন। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকটি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি নাটকই মহাভারতীয় চরিত্রের পুনর্নির্মাণে পরিপূরক ভূমিকা পালন করে।

ক্ষীরোদপ্রসদের পৌরাণিক নাটকে অতিরিক্ত ভক্তি বা গদগদ ধর্মবোধ বরাবরই দেখা যায়। 'সাবিত্রী' নাটকের প্রথম থেকেই মাত্রাতিরিক্ত ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে, 'দিদিরানির রূপের বর্ণনা শোনামাত্রই তারা অমনি ভুঁয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে মা বলে প্রণাম করে।'(১/১) মহাভারতে সাবিত্রীর পাণিপ্রার্থীরা তাঁর তেজঃপ্রভাবে ম্রিয়ম্লান, ''এই পদ্মপলাশলোচনা এরূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল; কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণে সাহস করিতে পারে নাই।''[১৩]

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার মতো নাটকে অশ্বপতিকে চিন্তান্বিত মনে হয়েছে, 'সাবিত্রীর জন্য যদি কুলধর্মনাশের সম্ভাবনা দেখি, তাহলে অমন সোনার মেয়েকেও আমাকে বিসর্জন দিতে হবে।'(১/২) শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে

তার প্রভাব পড়েছে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিবাহ না হলে পিতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা মহাভারতের কালে ছিল না। বরং নারী স্বাধীনতার দিক থেকে পরবর্তীকলের থেকে ন্যূন ছিল না। পিতা অশ্বপতি সাবিত্রীকে অকুণ্ঠিত ভাবে বলতে পারেন, ''বৎসে! তোমার সম্প্রদানসময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তোমার নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করে না; অতএব তুমি স্বয়ং আত্মানুরূপ ভর্তা অন্বেষণ কর।''[১৪] পিতা ও কন্যার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ককে একরাশ লজ্জা এসে গ্রাস করেনি। নাটকে স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচনের বিষয়টি উপস্থাপন করার জন্য মাণ্ডব্য ঋষির আগমন ঘটলেন নাট্যকার। মহাভারতে সাবিত্রী উপাখ্যানের মধ্যে মাণ্ডব্য ঋষির কোনো উল্লেখ নেই। তবু এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্যে মাণ্ডব্যকে নাটকের অন্যতম চরিত্ররূপে দেখা যায়। মহাভারতের আদিপর্বে বিদুরের জন্ম প্রসঙ্গে মাণ্ডব্যের কাহিনি শোনা যায়। তপস্যার প্রভাবে তিনি যমালয়ে গিয়ে যমকে তিরষ্কারকরে মানুষরূপে জন্মগ্রহণের অভিশাপ প্রদান করেন। পাপ-পুণ্য বিষয়ে তিনি যে নীতি নির্ধারণ করেন তা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়। সাবিত্রীও যমের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। এই সামান্য সাদৃশ্যের সূত্র ধরে নাটকে জায়গা করে নেন মাণ্ডব্য। এছাড়া বন্য পরিবেশে সাবিত্রীর অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে মাণ্ডব্যকে নিয়ে এসেছেন নাট্যকার।

নাটকে মূল কাহিনির সূত্রপাত হয়েছে তৃতীয় অঙ্ক থেকে। পূর্ববর্তী দুটি অঙ্ক নাটকারের নিজস্ব চিন্তার ফসল। বিবাহের আগে সত্যবানকে দেখানোর সুযোগ থাকলেও তিনি তা স্পষ্ট করে দেখাতে পারেন নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে সময় কালের ব্যবধান এক বছর। সাবিত্রি-সত্যবানের বনবাস জীবন অঙ্কনের অবকাশও নাটকে ছিল, কিন্তু গৌণ চরিত্রগুলি নিয়ে নাট্যকার এত বেশি কথা বলেছেন যে তা নাটকের কলেবর বৃদ্ধি করেছে মাত্র। তুম্বুরু-মালিনী নাট্যকাহিনিকে প্রলম্বিত করেছে হাস্যরস পরিবেশনের কৃত্তিম প্রচেষ্টায়। সাবিত্রীর উপাখ্যান যতই পৌরাণিক ভক্তি রসে প্লাবিত হোক না কেন, নাট্যদর্শক নাটকের মধ্যে আমোদই খুঁজতেন। তাই বারবার এই পর্বের বাংলা নাটকের মধ্যে স্থূল হাস্যরস পরিবেশনের প্রয়াস দেখা যায়।

নাটকে আশ্রমকন্যা অলিক্ষরার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সত্যবানের আসন্ন মৃত্যুর কথা জেনেও অলিক্ষরা সাবিত্রীকে পতির পুনর্জীবন প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে উসকে দিয়েছেন।

অলিক্ষরা : এ নিয়তির গতি কি রোধ হয় না? বিধিলিপির কি খণ্ডন নেই?
সাবিত্রী : দেবর্ষি বলেছেন--গতায়ু ব্যক্তিকে কেউ কখনো ফিরতে দেখেনি।
অলিক্ষরা : তুমিও কি তাই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে?
সাবিত্রী : উপায়-আত্মরক্ষার উপায়! অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার দান
অসম্ভব!-অলিক্ষরে সই! এ কি সম্ভব? প্রকৃতির আক্রমণ-আমি
অবলা-এ ভীষণ যুদ্ধে আমি কি তার যোগ্যা প্রতিদ্বন্দিনী? (৩/১)

মহাকাব্যে সাবিত্রীর এধরণের কোন দুর্বলতা দেখা যায়নি। এক বছর মাত্র আয়ুকাল জেনেও সাবিত্রী সত্যবানকেই পতিরূপে গ্রহণ করতে কোনরূপ দুর্বলতায় আবিষ্ট হননি। মহাকাব্যে সাবিত্রীর কনফিডেন্স যমকেও পরাস্ত করে, 'দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর।'

সাবিত্রী ও যমের কথোপকথনের মাঝখানে নাটকে দুটি দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। নাটকীয় উৎকণ্ঠাকে বাধা দিয়ে পরিনতি সম্পর্কে ভিন্নমুখী ভাবনার অবকাশ সৃষ্টির জন্যই এ প্রয়াস। যমের কাছ থেকে অনেকগুলি বর প্রাপ্তির পর যে চাতুর্যপূর্ণ অন্তিম বরটি সাবিত্রী প্রার্থনা করেছেন, নাটকে তা উল্লেখিত হয়েছে যমরাজের মুখে, 'যদি আমি তোমাকে শতপুত্রের বর দান করি, তা হলে তো আমাকে নিষ্কৃতি দাও?'(৪/৩) এখানে যমের কথায় যম নিজেই ফেঁসে গেছেন। মহাভারতে গূঢ় বাক্যবিন্যাস সাবিত্রীর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে-

''কন্যা বলে এই সত্যব্যনের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরসে।।
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
নিজ অঙ্গীকার বাক্য করহ পালন।।
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাহ গুণবতী।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি।।
. . . . . .

অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হতে।।
ইহার বিধান আগে কর ধর্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়।।''[১৫]

বস্তুত মহাভারতে সাবিত্রী-যম কথোপকথন নাটকীয় ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকে যমের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডা করতে করতে সাবিত্রী ক্রমশই যমকে অতিক্রম করে যান।

> 'আপনি আমাকে শতপুত্রের জননী হবার বরপ্রদান করেছেন, অথচ আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্য করে নিজেই সে সত্যপালনের অন্তরায় হচ্ছেন। আপনি যম,-চিরদিন নিয়মাধীন। মায়াবশে আপনি আমাকে বরপ্রদান করেননি। আমার পুণ্যবল আপনাকে আকৃষ্ট করে বরপ্রদানে বাধ্য করেছে।'(৫/৩)

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের পূর্বে একই বিষয় নিয়ে রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক'-এর প্রতিতুলনা আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়। বাংলা গদ্যে সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করে সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। নাটকের বিজ্ঞাপনে তাঁর রক্ষণশীল সমাজভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, ''বিশেষত বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যান বিশেষরূপে জানা আবশ্যক, তদ্বারা পাতিব্রত্য ধর্মের উদাহরণ ধর্মরূপে ও ধর্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসরণে সমর্থা হইবে।''[১৬]

কালীপ্রসন্নের নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। নট-নটীর কথোপকথন দিয়েই নাট্যকাহিনির অবতারনা করা হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকী, বিদূষক সখা-সখী সবই এই নাটকে রয়েছে। নাট্য সমালোচক সুশীলকুমার দে তাঁর সংস্কৃতানুবর্তীতার সমালোচনা করেছেন-

> ''সত্যবানের পূর্বরাগ ও বিরহাবস্থা, তদুপলক্ষে তাহার বন্ধু শ্বেতগর্ভের সহিত কথোপকথন, সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে কৃত্রিম, ভাবগদ্‌গদ ও বাগাড়ম্বরবহুল হইয়াছে।''[১৭]

নাটকে সখা শ্বেতগর্ভ ও সত্যবানের সংলাপে সমালোচকের মন্তব্যের যথার্থতা লক্ষণীয়-

> শ্বেতগর্ভ : তুমি নানাবিধগুণে ভূষিত ও দাক্ষিণ্য, সারল্য, বদান্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যকরূপে বিখ্যাত হইয়া সামান্য কামশরে বিমোহিত হওয়া উচিত নহে, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এমত স্বভাব অত্যন্ত হাস্যকর।
>
> সত্যবান : আমি স্বপ্নে যাহা দর্শন করিয়াছি, কি দিবা কি রাত্রি শয়নে ভোজনে ও অন্য কার্যের অনুসরণে সর্বদাই সেই কামিনীরত্ন আমার মনে উদয় হইতেছে, সখে! এক্ষণে আমার চিত্ত সমাধানের উপায় স্থির কর।(২/৩)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে পাত্রের অভাব। কালীপ্রসন্নের নাটকে সাবিত্রীর পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা ভিড় করেছেন। পিতা অশ্বপতি স্বয়ম্বর সভার কথাও আলোচনা করেন কিন্তু বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদের দ্বারা রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনায় তা পরিত্যাগ করেন। স্বেচ্ছানুসারী হয়ে পাত্রের সন্ধানে সাবিত্রী কিছুটা সংকুচিত, 'এমত কর্ম করিলে সমাজ ও কামিনীকুলের ঘৃণিত হইব।'(৩/৩) ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে সামাজিক শর্ত ছিল রাজার দিক থেকে, ষোল বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি বিবাহ না হয় তাহলে সাবিত্রীকে কুল ত্যাগ করতে হবে।

একদিকে সত্যবান একাকীত্বের বিরহে মজ্জমান ও অন্যদিকে সাবিত্রী ত্রিলোক অনুসন্ধান করেও মনোমতো পতির সন্ধান না পেয়ে প্রাণবিসর্জনের কথা ভাবেন। ঠিক এই মূহুর্তে সত্যবানের উপস্থিতি ও সখীদ্বয়ের সঙ্গে সাবিত্রীকে আড়াল থেকে প্রত্যক্ষ করণ, সত্যবানের ঋষিকুমার রূপে আত্মপরিচয় দান এবং সাবিত্রীর প্রতি তাঁর ব্যবহারের মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রভাব রয়েছে। শকুন্তলার মতো সাবিত্রীর মনোবিকলন তাঁর গানে প্রকাশিত -

> 'চরণ অবশ হল, চলিতে পারি না আর।
> দেহ লয়ে যেতে নারি, মনে করি পরিহার।।
> চঞ্চল নয়ন পুন, লইল স্মরণ তার।
> থরথর কলেবর, করিতেছে অঙ্গ যার।।'(৪/২)

মহাভারতে এরূপ প্রণয় দৃশ্য রচনার অবকাশ থাকলেও মহাকরির নিরবতাকে নাটকে তুলে ধরেছেন নাট্যকারেরা।

পৌরাণিক কাহিনিতে অকস্মাত নারদীয় উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়। বরং নারদ বা দুর্বাসার মতো চরিত্রের আগমন না ঘটলে নাটক জমে না। সাবিত্রী-সত্যবানের সম্পর্ক যখন পাকা হয়, তখন নারদ বাধা দেন, কেননা সত্যবানের আয়ু এক বছর মাত্র। তিনি পিতা অশ্বপতিকে সম্বন্ধ অনুমোদনে বিরত থাকার নির্দেশ দেন, 'মহারাজ! এক্ষণে সাবিত্রীকে নিরস্ত করুন আমি স্বয়ং লোকত্রয় ভ্রমণ করিয়া অসামান্য রূপগুণসম্পন্ন পাত্রে সাবিত্রী সমর্পণ করিব!(৪/৩) কিন্তু সাবিত্রী মনের দৃঢ় পরিচয় পেয়ে নারদ আশীর্বাদ করে যান, 'অপরূপ সুলক্ষণাক্রান্তা বালিকা কখনই বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিবে না।'(৪/৩) চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাট্যকার কাহিনির যে বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন, শেষ অঙ্কে তা অতি দ্রুত পরিনতি লাভ করেছে। বিবাহ-দৃশ্যের পরেই একবছর পরের মৃত্যু-দিনের দৃশ্য। মহাকাব্যের কাহিনির অন্তর্বর্তী শূন্যতা নাটকে পূর্ণতা পেল না। দীর্ঘ এক বছরের বন্য জীবনোপাখ্যান নাটকে অনুপস্থিত। অন্তিম দিনে সত্যব্যনের সঙ্গে বনে গমন কালে সাবিত্রীকে বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে না। বনের অপরূপ শোভা সাবিত্রী উপভোগ করেছেন রোমান্টিক নায়িকার মতো। সত্যবানের আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া তাঁকে ম্লান করে নি।

সতীনারীর ধর্ম নিষ্ঠায় যমকেও ফিরিয়ে দেয়ার যে আখ্যান মহাভারতে রয়েছে সেই কাহিনিকে নাটকের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণের নেপথ্য নীতিবোধের দ্বারা চালিত হয়েছেন উভয় নাট্যকার। কালীপ্রসন্নের নাটকে সত্যবানকে যতটুকু দেখা গেছে তাতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র ছাপ পড়েছে। কালীপ্রসন্ন নায়ক চরিত্র অঙ্কনের যে প্রয়াস করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ সে সুযোগ গ্রহণ করেন নি। সতীত্ব ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাস্তব জীবনের চিত্র অঙ্কনে বিস্মৃত হয়েছেন নাট্যকাররা।

উলূপী (১৯০৬) :

'বভ্রুবাহন' নাটকের পরিমার্জিত রূপ উলূপী নাটক। পূর্বের তিন অঙ্কের নাটক পঞ্চমাঙ্কের কায়া ধারণ করলেও মূল বক্তব্যে একই। উলূপীকে কেন্দ্র করে সমস্ত নাট্যঘটনা আবর্তিত হওয়ায় পরিবর্তিত নাট্যরূপটির 'উলূপী' নামকরণ সংগত হয়েছে। এই নাটকে 'বভ্রুবাহনের' কিছু দৃশ্য এবং বেশ কয়েকটি গান পরিত্যক্ত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই পরিস্থিতিতে গানের কথা বদলে দিয়েছেন নাট্যকার। আবার নতুন গান ও দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। 'বভ্রুবাহন' নাটকের পুণ্ডরীক ও নীলধ্বজ এর পরিবর্তে 'উলূপী' নাটকে এসেছে বৃষকেতু ও সত্যকি। গঙ্গা চরিত্রকে জাহ্নবীতে রূপান্তরে নাটকে কোনো স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জিত হয়নি। আগের নাটকের মতোই উলূপীর পরিচয় এক পৌরাণিক সতী রমণী।

'বভ্রুবাহন' সঙ্গে 'উলূপী' নাটকের কাহিনির দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। নাট্যকার যে কয়েকটি স্থানে পরিবর্তন করেছেন মহাভারতের প্রেক্ষিতে সেই নতুন অংশগুলির কোনো তাৎপর্য রয়েছে কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ। প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যের শুরুতে উলূপীর অনুপস্থিতিতে ইলাবন্ত কুরুযুদ্ধে যোগদানের পূর্বে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন চিত্রাঙ্গদার কাছে। মহাকাব্যে এমন কোনো তথ্য না থাকলেও যুদ্ধের পূর্বে মাতার আশীর্বাদ গ্রহণের পৌরাণিক ছক সকল সন্তানেরাই মেনে চলেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রাসঙ্গিকতায় নাট্যকাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। 'বভ্রুবাহন' নাটকে এই সংযোগহীনতা চোখে পড়ার মতো। তবে উভয় নাটকেই ইরাবানকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ব্যাসদেব ও যুধিষ্ঠিরের সংলাপ দিয়েই মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের শুরু। জ্ঞাতিবধজনিত যুধিষ্ঠিরের আত্মগ্লানি প্রশমিত করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান দেন ব্যাসদেব। নাটকে যুধিষ্ঠির ও ব্যাসের সংলাপ মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিনামকে নিদারুণ বাস্তব

দিক থেকে ব্যাখ্যা করে। সংলাপ একটু দীর্ঘ হলেও যুধিষ্ঠিরের জ্বালাময়ী ভাষণের তীব্রতা কাশীরামের পয়ারে ধরা পড়েনি।

''পিতামহ ভীষ্মদেবে করিনু সংহার।
আমার সমান কেবা পাপী আছে আর।।
শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য হয়েন ব্রাহ্মণ।
বিনাস করিনু তাঁকে শুন তপোধন।।
সহোদর কর্ণবীরে অর্পিনু শমনে।
বধিলাম শতভ্রাতৃসহ দুর্য্যোধনে।।
আর যত সুহৃদ বান্ধবগণ ছিল।
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল।।''[১৮]

নাটকে যুধিষ্ঠিরের সংলাপ, 'সমস্ত গুরুজন, সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু আটারো অক্ষৌহিণী ভারতীয় বীর শুধু আমার লোভের জন্য ভীষণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে। এপাপের ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পতিহীনা আর্যরমণীগণের চিৎকারে আমার নিশীথনিদ্রা ভেঙে যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে স্তূপীকৃত, শৃগাল-শকুনি কর্তৃক ছিন্নভিন্ন সেইসব বিকলাঙ্গ শবের মূর্তি দিবারাত্র আমার চোখে জাগছে।'(২/১) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে রচিত এই নাটকে 'ভারতীয় বীর' শব্দটি এবং ব্যাসদেব যে ভারতের 'বিষম ভবিষ্যৎ' দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে জাতীয়তাবোধের বীজ নিহিত রয়েছে।

পৌরাণিক নাটকে শ্মশান দৃশ্যের অবতারণা হতেই পারে তবে এই নাটকে উলূপীর পতিপ্রেম স্বাভাবিকতা বজায় রাখেনি, অতিরঞ্জিত বিকারে পরিণত হয়েছে। শ্মশানে জাহ্নবীর উপস্থিতি ও উলূপীর সঙ্গে তার কথোপকথন সহানুভূতি আদায়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। অর্জুনের আগমন এবং ইলাবন্তকে পিতৃহত্যায় উলূপীর প্ররোচনা মানবিকতাকে আতিক্রম করে যায়। কুরুযুদ্ধ বিজয়ী অর্জুন শ্মশানে এসে ভয় পাবেন তা নিতান্তই হাস্যকর। ইলাবন্ত উলূপীর কথানুযায়ী অর্জুনকে হত্যা না করায় তিনি বভ্রুবাহনের সন্ধান করেছেন। 'আমার অধম সন্তান আমার কথা শুনলে

না। সুবিধা পেয়েও আমার কথা রাখলে না। আমি অন্য সন্তানের সন্ধানে চলেছি।'(২/৩) আবার বভ্রুবাহনকে উত্তেজিত করতে উলূপীর তির্যক কটাক্ষ ব্যর্থ হয়নি, 'ঘোড়া একানে এসে অপ্রস্তুত হয়াছে, বুঝেছে এ রাজ্যে বীর নেই।'(২/৪)

স্বামীকে নরকের হাত থেকে নিস্তার দেবার জন্য তার মরণের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করার যুক্তিকে নাট্যকার যতই ভক্তিরসে নিমজ্জিত করুন না কেন এ যেন প্রকৃতি বিরুদ্ধ উচ্চারণ। উলূপী চরিত্র সৃজনে নাট্যকারের দুর্বলতা সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বাসবী রায় মন্তব্য করেছেন -

> ''জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এক নারী কীভাবে মহৎ আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তার দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ স্তর-পরম্পরা দেখানোর সুযোগ উলূপী চরিত্রে ছিল। কিন্তু, মাতৃত্ব ও স্বাধ্বী স্ত্রীর আদর্শের দোলাচলতায় সৃষ্ট জটিল নারীচরিত্র ক্ষীরোদ প্রসাদের অনায়ত্ত থেকে গেল।''[১৯]

'বভ্রুবাহন' নাটকে মণিপুরের কৃষকদের দৃশ্য এ নাটকে বর্জিত হয়ে মেদহীন হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি সম্পূর্ণ নতুন এবং নাটকে তা ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে। যজ্ঞাশ্ব অনুসরণ করে মণিপুরে পদার্পন করার পর অর্জুনের মনে যে নস্টালজিক অনুভূতি পূর্বের স্মৃতিকে জীবন্ত করে তোলে তা মহাকাব্যের অনুচ্চারিত অধ্যায়কে দেখিয়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদা ও পুত্র বভ্রুবাহনের স্মৃতিতে অর্জুনের কণ্ঠ হতে কাব্যময় ভাষা উৎসারিত হয়। অর্জুন তখন কুরুযুদ্ধ বিজয়ী নন, রোমান্টিক নায়কের মতো বলতে থাকেন-

> 'সে বহুদিনের কথা। সাত্যকি! সেইসময় ভ্রমণ করতে করতে আমি মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলুম। তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের এ অপূর্ব উপত্যকা যাদুমন্ত্রে যেন আমাকে মুগ্ধ করে, বহুদূর থেকে আমাকে আকৃষ্ট করে নিয়ে এসেছিল। . . . শুভ্রবসনা এক মদিরলোচনা সুন্দরী আপনার মনে ভ্রমণ করছিলেন। সে সৌন্দর্য দেখে আমি মুহূর্তসময়ের মধ্যে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলুম। সে সুন্দরী মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা।'(৩/১)

পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করায় বভ্রুবাহনের মনে যেমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করেছে, একই রকম অর্জুনের দিক থেকেও পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে বিচলিত বোধ করেছেন। নাট্যকার অর্জুনের মনের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছেন। যজ্ঞাশ্ব প্রত্যার্পনের ক্ষেত্রে বভ্রুবাহন গলবস্ত্র হয়ে অর্জুনের সম্মুখে আসার পরিবর্তে তিনি জানিয়েছেন, 'তৃতীয় পাণ্ডব নিজে না এলে অন্য কাউকেও তিনি ঘোড়া দেবেন না।'(৩/১) এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণ বভ্রুবাহনকে যে ব্যাক্তিত্ববোধে উত্তীর্ণ করে, মাতা চিত্রাঙ্গদার নির্দেশে তা বিনম্র ভক্তিতে রূপান্তরীত হয়ে যায় পরক্ষনেই। সংযোজিত তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে বভ্রুবাহনের দীর্ঘ আত্মপীড়ন নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। এই পর্বে গঙ্গাদেবীর আগমনের ইঙ্গিত কাশীরামের আখ্যানে রয়েছে -

> ''বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে।
> কহেন সকল কথা বভ্রুবাহ-কানে।।
> তাহা শুনি আনন্দিত হৈল নরপতি।
> রাখিলেন গঙ্গা-অস্ত্র করিয়া শকতি।।
> মহাবেগে গঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল।
> অর্জুনের মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল।।''[২০]

ভীষ্মকে নিধনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুনের মৃত্যুর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন মহাভারতকার। ''আপনি ভারতযুদ্ধে অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্বক মহাত্মা ভীষ্মকে নিপীড়িত করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে বভ্রুবাহনের হস্তে পরাজিত হওয়াতে আপনার সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইল।''[২১] উলূপীর কাছ থেকে অর্জুন এ তথ্য জ্ঞাত হয়েছেন পুনর্জীবন লাভের পর। উলূপীর ভূমিকাকে সমালোচক ব্যাখ্যা করেছেন, ''যুদ্ধে যে অন্যায়টুকু অর্জুন করেছিলেন, শিখন্ডীকে ব্যবহার করার সময়, সেই অন্যায়কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উলূপী কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।''[২২] কিন্তু নাটকে মৃত্যুর পূর্বেই, বভ্রুবাহনের যুদ্ধের পরাক্রম অর্জুনের মনে ভীষ্মের যুদ্ধের প্রতিবিম্বন সৃষ্টি করে তাঁকে উপলব্দি করায়, 'পিতামহকে সমরক্ষেত্রে পাতিত করে আজও পর্যন্ত মর্মের যাতনায় অস্থির হয়ে রয়েছি। বুঝি প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভগবান আমাকে মণিপুরে প্রেরণ করেছেন। . . . বোধ হচ্ছে

যেন দ্বিতীয় ভীষ্ম সমরে অবতীর্ণ।'(৪/১) বভ্রুবাহনের যুদ্ধ দেখে ভীষ্মের কথা মনে হওয়ার প্রসঙ্গ মহাকাব্যে নেই। নাট্যকার বভ্রুবাহনের অস্ত্রগুরু রূপে ভীষ্মকে কল্পনা করেছেন এই যুক্তিতে যেভাবে দ্রোণাচার্য একলব্যের গুরু হয়েছেন।

নাটকের শেষাংশকে নাট্যকার অহেতুক প্রলম্বিত করেছেন। ইলাবন্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান, মণির প্রভাব ও যুদ্ধের মাঝখানে বৃদ্ধ অনন্তের উপস্থিতি কাহিনিকে স্থূল ভারাক্রান্ত করেছে। মণির প্রভাবে ইলাবন্তের নিকট বভ্রুবাহনের পরাভব কাহিনিকে জটিল করে তুলেছে। নাগরাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত যে মণির প্রভাবে ইলাবন্ত জয়ী হয়েছে উলূপী সেই মণি তার কাছ থেকে ভিক্ষা করে নেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে ইলাবন্তের মৃত্যু ঘটে বভ্রুবাহনের হাতে। সঞ্জীবনী মণির প্রভাব বোঝাতে নট্যকারের এত কৌশল। নিজের গর্ভজাত সন্তানের মৃত্যুতে উলূপীর বিন্দু মাত্র কষ্ট নেই! নাগরাজের ব্যঙ্গোক্তি যথাযথই, 'উঃ! বেটি ধর্মকর্ম করতে এসেছে! স্বামী মেরে, পুত্র মেরে বেটির ধর্ম।'(৫/১)

নাট্যকার কৃত্রিম ধর্মবোধে উলূপীকে এমন যান্ত্রিক ভাবে চালিত করেছেন যে তার মনের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, হৃদকম্প নেই, এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মরিয়া। পৌরাণিক অনেক কাহিনিতে ধর্মরক্ষার্থে সন্তান উৎসর্গের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বিদীর্ণ অন্তকরণের হাহাকার কেউই গোপন করতে পারেন নি। উলূপী এখানে হৃদয়হীন, মানবিক হৃদয়ের অধিকারি হয়ে আছেন বৃদ্ধ নাগরাজ অনন্ত। নাটকের মধ্যে বারবার তার উপস্থিতি, অহেতুক বাচালতা একঘেয়ে কিন্তু তার স্নেহান্ধ হৃদয়টি উপেক্ষনীয় নয়। পূর্বে রচিত 'বভ্রুবাহন' নাটকের সংস্কার করেই ক্ষীরোদপ্রসাদ 'উলুপী' নাটকটি রচনা করেছেন। এই নাটকের মূল চরিত্র উলুপীকে 'বভ্রুবাহনে'র থেকে আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। অলৌকিক ঘটনাবলী সমন্বিত পূর্ববতী নাটকের তুলনার এই নাটকেই বভ্রুবাহন চরিত্রের সাবলীলতা প্রকাশ পেয়েছে। একই কাহিনি নিয়ে দুটি নাটক লেখার অনুপ্রেরণায় মহাভারতের প্রতি নাট্যকারের প্রবল আসক্তি লক্ষ্য করা যায়।

ভীষ্ম (১৯১৩) :

মহাভারতের যে পাঁচটি চরিত্র নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে একমাত্র 'ভীষ্ম' নাটকটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবন মহাভারতের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়েই বিস্তৃত। ফলে নাট্যকারদের পক্ষে একটি নাটকের মধ্যে ভীষ্মের জীবনকে উপস্থাপন করা কষ্ট কর। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকটি বিশ্লেষণে মহাকাব্যিক এই চরিত্রের বিবর্তন লক্ষণীয়।

নাটকের প্রস্তাবনা অংশে রয়েছে ভীষ্মজন্মপূর্ব দৈব আখ্যান। মহাতপা আপবের আশ্রমের কামধেনু বসু পত্নীর মন আকর্ষণ করলে বসুগণ তা হরণ করেন ফলে ঋষির শাপগ্রস্থ হন। তাই প্রধান বসুর মনে হয়েছে এই বিপদের মূল তার স্ত্রী। 'আছে চিরপ্রথা, এ সংসারে/ জঞ্জাল ঘটায় নারী।' এখান থেকেই তার নারীর প্রতি বিরাগ মানব জন্মে যিনি ভীষ্ম হবেন। 'যতদিন ধরা মাঝে করিব বিহার নারীরে লব না সঙ্গী জীবনের পথে।' আবার পরশুরামের কাছে যার অস্ত্র শিক্ষা সেই গুরুদেবের সঙ্গে যে ভীষ্মের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হতে পারে তারই পূর্বাভাস নাটেকের শুরুতেই দেয়া হয়েছে।

সত্যবতীকে পরাশর মুনি পদ্মগন্ধা হওয়ার বর দিয়েছিলেন কিন্তু তা কার্যকরি হয়েছে পরশুরামের সঙ্গে তার সাক্ষাতের পর থেকে। শান্তনু সত্যবতীকে স্পর্শ করেছে নিজের স্ত্রী-ভ্রমে এবং সাক্ষাতেই তাদের মধ্যে প্রেম-পরিণয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছে। আর এরই সূত্র ধরে দাশরাজ সপত্নী কন্যাকে নিয়ে একেবারে শান্তনুর রাজদরবারে হাজির হন। শান্তনুর আগ্রহের চেয়ে এদের আগ্রহটাই বেশি। ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করে রাজার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেয়াই এদের উদ্দেশ্য। শান্তনুকে সত্যবতীর চিন্তায় ক্রমে জীর্ণ বিশুষ্ক হতে দেখা যায় না। ভীষ্মই হঠাৎ প্রকাশ্য রাজদরবারে তার রাজ্যাধিকারত্যাগ ও আজীবন ব্রহ্মচর্যের নিদারুণ অঙ্গীকারে নিজেকে আবদ্ধ করলেন। যে কূট উদ্দেশ্য নিয়ে ধীবররাজ এসেছিলেন তা

মাত্রাতিরিক্ত সাফল্য পেল। সত্যবতীকেও অত্যন্ত বেশী সরল করে দেখানো হয়েছে, হয়ত সমগ্রটাই ধীবররাজের চাতুর্য।

শাল্বের সঙ্গে অম্বার প্রণয়ের দৃশ্যায়ণ মহাভারত অনুমোদিত কিন্তু কাশীরাজ কন্যা সম্প্রদানের জন্য ভীষ্মের নিকট কোনো দূত প্রেরণ করেননি। কাশীরাজ অঙ্গনে ভীষ্ম ছিল সম্পূর্ণ অনাহুত, অনিমন্ত্রিত। নাটকে কাশীরাজ দূত প্রেরণ করেছেন কিন্তু শাল্ব কৌশলে সেই পত্র চুরি করে ভীষ্মের কাছে গোপন করেন। এই বার্তাটি ভীষ্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য গঙ্গা দেবীকে আহবান করতে হলো। গঙ্গা এখানে সম্পূর্ণতই দেবকার্য সম্পাদনের বাহক, মানবী চরিত্র নয়। অম্বাকে পুত্রিকা করে রাখার অভিলাষের কথা মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রোজেকশন।

কাশীরাজ স্বয়ংবর সভারই আয়োজন করেছিলেন। অতশত রাজার পরামর্শ নিয়ে বীর্যশুল্কা কি অন্য কোনো বৈকল্পিক ভাবনার দ্বারা বিচলিত হননি। 'সমরে বিজয়ী হয়ে যেবা মোরে করিবে গ্রহণ আমি তাঁর নারী' - অম্বার এ হেন সংলাপের সুযোগ মহাভারতে ছিল না। বালক বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহের প্রসঙ্গে অম্বা ঘৃণায় লজ্জায় বিস্ময়ে বিমূঢ় ভীষ্মের প্রতি প্রতারণার অভিযোগ হেনেছেন এমন ভাবে যেন ভীষ্মকে মেনে নিতে তার আপত্তি ছিলনা-

'অপ্রেমিক ব্রহ্মচারী-
নয়নে প্রেমের চিহ্ন করিয়া গোপন
প্রতারণা করে, আমারে হরিল স্বয়ংবরে!'

এইখানে একটু খটকা লাগে এই জন্যই যে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহের কথা ওঠার পর অম্বা শাল্বরাজের প্রসঙ্গ তুলেছেন। অম্বা নিজেই কেন ভীষ্মের রথে উঠেছিলেন তার কৈফিৎ স্বরূপ অম্বা বলেছেন, 'পাছে তিনি করগ্রহণ করেন, এই ভয়ে আমি তার রথারোহণ করেছিলাম।' নাট্যকার ভীষ্মকে দিয়ে অম্বার হাত ধরাননি। কালীপ্রসন্ন সিংহের বর্ণনা- ''তিনি অন্যান্য ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া বলপূর্বক তোমার করগ্রহণ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি আর তোমাকে প্রার্থনা করি না। তুমি তৎকালে ভীষ্মের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলে।''[২৩]

কাশীরাম অত পেঁচের মধ্যে যাননি তিনি সহজ সরল ভাবে সব খুলেই বলেছেন-

''আমার অনুজ আছে শান্তনু-নন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিনু বরণ।।''[২৪]

''যেমন কোন গাভীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃষদ্বয় গভীর নিনাদ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবলপরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহাড়ম্বরপূর্বক তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন। শাল্বরাজ ভীষ্মের প্রতি উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ''[২৫] করেছেন। নাটকে এই যুদ্ধ সহাস্যে উপেক্ষিত হয়েছে। অম্বা শাল্বরাজের রাজধানীতে তার সভাতেই হাজির হয়েছিলেন কিন্তু নাটকে তা বনপথের মধ্যেই এই সাক্ষাত সংঘটিত হয়েছে এবং শাল্বরাজের ভীরুতাও প্রকাশ পেয়েছে- 'ভীষ্ম ভয়ে আজি ভীরু ত্যজিলি আমারে!' শাল্ব অম্বাকে শাররীক ভাবে আঘাত করতেও উদ্যত হয়।

অকৃতবন ও ভীষ্মের কথোপকথন নাট্যকারের সংযোজন। অম্বা সর্ম্পকে ভীষ্মের কী সংঘাতিক ধারণা 'সে আপনার আশ্রয়গ্রহণ করতে পারে না।' নরনারাণের আগমন-প্রতীক্ষায় ভীষ্ম যে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করছেন এই কারণটিও নাট্যকার অম্বা-প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গে যুক্ত করেছেন।

পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধের প্রাক্কালে মাতা গঙ্গা ও সত্যবতীর মধ্যে আপত একটি সতিন কলহের সুযোগ নাট্যকার ছাড়েননি। বাস্তবিক সত্যবতী পরশুরামের সামনে যান নি তবে ভীষ্ম যুদ্ধে যাওয়ার আগে সত্যবতীর অনুমতি নিয়েছেন আর অন্যদিকে গঙ্গা ভীষ্মকে বারবার নিষেধ করেছেন ভার্গব-বিরুদ্ধ যুদ্ধে।

'ধরো পুত্রে, নিষেধ করহ সত্যবতী!
সমরে আমার পুত্রে উত্তেজিত করে,
বিমাতার যোগ্য কার্য কোরো নাকো নারী!'

ভীষ্ম ও পরশুরামের বাক্‌যুদ্ধে ভীষ্মের কণ্ঠে আরো একটি প্রখর সংলাপ শোনা গেল, ‘আপনাতে-আমাতে প্রভেদ আছে। আপনি ব্রহ্মণ আমি ক্ষত্রিয়।’ গুরু-শিষ্যের এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধকে অন্যএক মাত্রায় উন্নীত করে। মাতা গঙ্গার একটি সংলাপে তা আরো প্রকটিত হয়েছে- ‘ভীষ্মের নিধন- জেনো রাজা,/ ক্ষত্রকুল-বিনাশের প্রারম্ভ সূচনা।’

আখ্যানে নাট্যকার আরো একবার শাল্বকে এনেছেন সম্ভাব্য যুদ্ধ যাতে না হয়। তাই শাল্ব অম্বাকে খুঁজতে ছুটেছে ফলে শাল্ব চরিত্রের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। ‘আত্মবলিদানে যদি তুষ্ট হয় নারী/ আত্মবলি দিব তার পদে!’ তার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে যে যদি শাল্বই এই যুদ্ধের কারণ হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত ক্রোধ ভীষ্মের উপর কেনো? প্রকৃতপক্ষে অম্বার নিদারুণ পরিনতির জন্য ভীষ্মকেই দায়ী মনে করেছেন কাশীরাজ কন্যা। গঙ্গা প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছেন অম্বার ক্রোধ প্রশমনের জন্য, তিনি শাল্বকে উদ্বুদ্ধ করেছেন অম্বার পা স্পর্শ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে। অতপর শাল্বকে ধিক্কার দিয়েছেন ‘পাইয়া এমন নারী, মদমত্তে- হারায়েছ তারে!/ মুখ আর দেখায়ো না মানবসমাজে।’

পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার আগেই অম্বা তার সাধনা শুরু করে দিয়েছে, কেননা তার মনে এক সন্দেহের উদয় হয়েছে যে ভার্গব তার প্রিয় শিষ্যকে স্নেহ বসত বধ নাও করতে পারে। তাই সে নিজেই ভীষ্মবধে কৃত সংকল্প- ‘গুরু-শিষ্যে রণ, তাই দেবী প্রতিক্ষণ/ সন্দেহ জাগিছে মোর মনে।’ আবার ঠিক একই ধরণের দুর্বলতার কথা ব্রহ্মণবেশধারী বসুর মনে হয়েছে ভীষ্ম সম্পর্কে, ‘গুরু-বধ-ভয়ে সে অস্ত্র স্মরণে আনতে সাহস করছ না।’

গঙ্গা ও অম্বার দীর্ঘ কথোপকথন নাটকে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। মূল আখ্যানে গঙ্গা অম্বাকে অভিসম্পাত করেই তুষ্ট থেকেছেন, অম্বাকে কোন অপবাদ দেননি কিন্তু নাটকে অম্বার চরিত্র সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ হেনেছেন-

‘পাপিষ্ঠা কামুকী তুই।
একজনে সঙ্গোপনে করি আত্মদান,

ভীষ্মের অপূর্ব বীর্য হেরি,

ফের তুই তার তরে কামাতুরা নারী।'(৩/৩)

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দ্রুপদ ও দশার্ণরাজের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ঘটনা কালকক্রমানুযায়ী অনেক পূর্ববর্তী কিন্তু নাটকে এই ঘটনাকে অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের সমসাময়িক করে দেখানো হয়েছে। আসন্ন সংকটের জন্য দ্রুপদ ওই বিবাহ উৎসবে যোগদান 'একরূপ অসম্ভব' বলে জানিয়েছেন। আখ্যানে দ্রুপদ ও দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার মধ্যে দূতের মাধ্যমেই কথা চালাচালি হয়েছে। নাটকে দূত একবারমাত্র দশার্ণরাজের আগমণ বার্তা জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। দশার্ণরাজ প্রত্যক্ষ ভাবে দ্রুপদের সঙ্গে বাক্য যুদ্ধে অবতীর্ণ। নারীরূপ শিখন্ডীকে দশার্ণরাজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়ায় এই ঝামেলার সূত্রপাত। দ্রুপদ চরিত্রটি এখানে হাস্যরসিক করে নাটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। -

দশার্ণ : প্রতারক! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

দ্রুপদ : সর্বদাই প্রস্তুত বৈবাহিক! . . . বৈবাহিকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ হতে পারে, বাহু আস্ফাটন করে অজাযুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু কদাচ অসিযুদ্ধ হতে পারে না।

দশার্ণ : নির্লজ্জ! এরূপভাবে কথা কইতে এখনও তোমার মুখ আছে?

দ্রুপদ : শুধু কথার জন্য কেন বৈবাহিক, ভোজনের জন্যও আছে।

পরশুরাম কতৃক পুরুষবেশী শিখন্ডীকে নিয়ে এসে আপাত এই সমস্যার মীমাংসা করেছেন নাট্যকার। শিখন্ডীর পুরুষত্ব প্রাপ্তি বিষয়ক যক্ষ স্থূণাকর্ণের অলৌকিক কাহিনী পরশুরামকে মঞ্চে এনে তা এড়িয়ে গেছেন নাটকের স্বার্থে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য উদ্যোগপর্বের শুরুতে বলরাম ও সাত্যকির পারস্পরিক মতান্তরের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। মহাকাব্যের রাজনৈতিক কথোপকথন নাটকে অনেকটা ঘরোয়া ভাবে পরিবেশিত হয়েছে -

সাত্যকি : যাও, যাও-সোমরস তোমায় চিনেছে, তুমিও সোমরসকে চিনেছ। তাই বসে বসে কলসি কলসি পান করো।

বলরাম : আরে মলো। অন্যায়টা কী করে হল বল! মিছামিছি রক্তপাতটাই কি ভালো? দুর্যোধন কী অধর্ম করেছে?

সাত্যকি ও বলরাম কে আবার এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখা গেল। এখানে দুর্যোধনকে কিছুটা নম্র করেই দেখানো হল, 'একটু বিনয় করে চাইলে সে তখনই অর্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিত।' - বলরামের এই উক্তি সমর্থন যোগ্য নয়। এখানে বলরাম ও সাত্যকির হাস্যরসাত্মক কথোপকথনের সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের ভক্তি রসের স্ফুরণ ঘটেছে- 'আমি মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে তোর কাছ থেকে একটু কৃষ্ণ ভক্তি রস আদায় করে নিই।' এই নাটকেও কৃষ্ণ ঈশ্বর বলে স্বীকৃত।

পাণ্ডব পুরোহিত ধৌমের প্রশ্নোত্তরে ভীষ্মত্বের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। যখন দুরাত্মা দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কুরুসভামধ্যে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে অপমান করছিল তখন ভীষ্ম কেন নীরব ছিলেন? এর উত্তর নাটকে যেভাবে দেয়া হয়েছে তা শোনার আগে আখ্যানের ভাষ্য স্মরণ করা যাক, ''ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন না। বলবান্ লোক ধর্মানুসারে চলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ধর্ম অভিভূত হইয়া অধর্মকে প্রশ্রয় দিতেছে।''[২৬] -সভা মাঝে এতবড় একটা অন্যায় ঘটে যাওয়ার পরও ভীষ্মের গলা কী নিরুত্তাপ! এই কৈফিয়তটা নাটকে নতুন ভাবে দেয়া হয়েছে- 'সেদিন আমি ক্রুদ্ধ হলে, সর্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরকে বধ করতুম। . . . যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য ভীমাদি চারি ভ্রাতা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করত! সুতরাং প্রথমেই পঞ্চপাণ্ডবেরা আমার হাত সংহার হত! তারপর কুরুকুল-বংশে বাতি দিতে একটি ক্ষুদ্র বালক পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকত না।'(৪/৩) সনাতন ধর্মের দোহাই দিয়ে ভীষ্মের সমযোদ্ধা রূপে যুধিষ্ঠিরকে তুলনা করা অত্যুক্তি মাত্র।

বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের সংবাদ শিখন্ডীর মাধ্যেমে কুন্তীর কাছে প্রেরণ করার ঘটনা নাটকে সংযোজিত হয়েছে। শিখন্ডীকে দেখামাত্র ভীষ্মের চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কেননা শিখন্ডীর নারীত্ব মুছে গেছে কিন্তু প্রতিহিংসা যায়নি। শিখন্ডীর মনের ভেতরও প্রতিহিংসা জ্বলে উঠেছে- 'তোমারে দেখিবামাত্র/ সহসা অন্তর কেন উঠিল জ্বলিয়া?' শিখন্ডীকে

শিশু বা বালক সম্মোধনের মাধ্যমে স্নেহ নৈকট্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাককালে শিখন্ডী পূর্ণবয়স্কই ছিল।

নাটকে ভীষ্মের মৃত্যুর প্রসঙ্গ একটু একটু করে উপস্থাপন করা হচ্ছে -

বিদুর : আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার মনে ধরণীত্যাগের অভিলাষ জেগেছে।(৪/৩)

ভীষ্ম : হে বিদুর! মৃত্যুমূর্তি দেখিনু বালকে। (৪/৫)

কুরুযুদ্ধে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে নেয়ার জন্য দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়েই কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলে একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক আলোচনার সময়ও বাঙালি নাট্যকার পরিহাস করার সুযোগ ছাড়েনি-

দুর্যোধন : পায়ের তলাতেই বসো আর যাই করো, তোমাদের কৃষ্ণকে এবার আয়ত্ত করেছি।

অর্জুন : সে যদি পার, সে তো সুখেরই কথা ভাই।

দুর্যোধন : বিরাটের সভায় নাচওয়ালি হয়েছিলে নাকি?

অর্জুন : সবই তো তুমি জানো!

দুর্যোধন : ছি ছি! পুরুষত্বের অভিমান করো, কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে মেয়েমানুষ সাজলে হে!

(৪/৪)

ভীষ্মের সঙ্গে শিখন্ডীর সংলাপ নাট্যকারের সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবনা। শিখন্ডীর অন্তর্লোকের যন্ত্রনা ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠে-

‘নররূপধারী, কিন্তু হায়
এখনও হৃদয় মোর নারী!
বড় জ্বালা-বড় জ্বালা
হে গাঙ্গেয়! আর আমি বলিতে না পারি।’

যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির অস্ত্রহীন হয়ে কৌরব সৈন্যের ভেতর প্রবেশ করছেন ও অন্য চার ভাই তার অনুগমন করছেন তখন কৌররপক্ষীয়রা পাণ্ডবদের ভীরুতা মনে করে তাদের নিন্দায় মুখর হয়েছিল। নাট্যকার এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লগিয়েছেন।

দুঃশাসন : কী ভীমসেন-(বক্ষ দেখাইয়া) এটাকে চিরে রক্ত খাবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে না!

. . . .

দুঃশাসন : শুধু পাঁচ ভাই কেন হে?-পঞ্চবীরের প্রাণপুতুলি পাঞ্চালী কই? তাকে সঙ্গে আনলেই ভালো হত।

শকুনি : আমরা মাতুলের জাত-আমরা চোখ বুজে থাকব-সঙ্গে নিয়ে এসো যুধিষ্ঠির, পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

উদ্যোগপর্বের ভীষ্ম এবং কর্ণের পরস্পর আক্রোশকে নাটকের প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানে দেখানো হয়েছে। 'পরশুরামের কৃপায় পরশুরামবিজয়ী' বলে ভীষ্মকে শ্লেষ হেনেছেন কর্ণ। সাত্যকি ও বলরামকে নাটকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাত্যকি বলরামকে দিয়ে কুরুবধের পরিকল্পনাও করেছিলেন। 'যদি জনার্দনের সঙ্গে এক রথে উপবিষ্ট হয়েও তৃতীয় পাণ্ডব শত্রুসংহারে অকৃতকার্য হন, তা হলে বলিশ্রেষ্ঠ তোমাকেই দিয়ে পাণ্ডব-রিপুকুল নির্মূল করাব।'

ভীষ্মের চিরকৌমার্যের প্রতিজ্ঞায় ত্যাগের মহিমা এবং কৌরব বংশের ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির নেপথ্যে বীরত্বের জয়গান যতই থাকুক না কেন বাংলা নাটকের দর্শকের মনে ভক্তিরসের প্রাবল্যই বেশি আবেদন সৃষ্টি করে। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু অবধি ভীষ্ম চরিত্রের কোনো রূপ পরিবর্তন ঘটে নি বলে নাটকের পক্ষে চারিত্রিক বিকাশের পথ অবরুদ্ধ। মহাকাব্যিক বিশালতা নিয়ে বিপুল সম্ভাবনাময় ভীষ্ম চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজিডির বহু উপকরণ থাকলেও কোন নাট্যকারই তা সার্থক ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হন নি। বাস্তবিক ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম এত বেশি আদর্শে ছকে বন্দী যে মহাভারতে অনুশাসন অতিক্রম করতে ব্যর্থ হন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) :

উনিশশতকে বাংলা নাটকের সূচনা লগ্ন থেকে মহাভারত কাহিনি অবলম্বন করে নাটকরচনার ক্ষেত্রে যে অনুকরণ প্রবণতা দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে এই রূপান্তর পৌরাণিক ভক্তিরস থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিশশতকের আধুনিক যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যবলয় থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পুরাণ কাহিনিকে ভেঙে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়। তাই তাঁর সৃষ্ট ভীষ্মকে অতিমানবীয় সত্তা ত্যাগ করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রক্তমাংসের মানুষ রূপে মঞ্চে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহাভারত আশ্রয়ী নাট্যকাব্যগুলিতে মূল কাহিনি প্রায় অপরিবর্তিত রেখেই পৌরাণিক কাহিনির নবরূপায়নে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমূল পরিবর্তন সংযোজন করতে হয়েছে। তাঁর নাটক সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য–

> ''দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এর অলৌকিক আবরণ উন্মোচন করেছেন। তাই তাঁর পুরাণাশ্রয়ী নাটকগুলিকে দেবদেবীর অলৌকিক জীবনাচরণের কথা নেই, আছে নরনারীর বাস্তবজীবনের মানবীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের কাহিনি। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী ও সংস্কার মুক্ত পুরাণের নবরূপায়ণ পদ্ধতিটি চরমরূপ লাভ করেছিল।''[২৭]

দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাণ আশ্রয়ী নাটক রচনা করতে গিয়ে প্রচলিত নাট্যধারাকে প্রবল আঘত করলেন। মনোমোহন বসুর পূর্ব পর্যন্ত পুরাণ-কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকারেরা পুরাণকে সোজাসুজি অনুসরণ করেছেন। মনোমোহন বসু এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকে তরল ভক্তিরস, যাত্রাসুলভ আঙ্গিক এবং প্রচুর গানের বাহুল্য লক্ষণীয়। গিরিশচন্দ্রও ধর্মকথা প্রচারের বাহনরূপে পৌরাণিক নাটককে গ্রহণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মনোভাব নিয়ে আসতে চাইলেন। তিনি যাত্রারীতিকে অনুসরণ করেন নি, ভক্তিরসের পরিবর্তে অলৌকিক ঘটনার আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দানে সচেষ্ট হয়েছেন। 'পাষাণী' নাটকে অহল্যার চরিত্রস্খলনে মানবিক মনস্তত্ত্বের সন্ধান করেছেন। ইন্দ্রের

অভিশাপ অথবা অহল্যার পাষাণে পরিনত হওয়া দুই-ই তার কাছে অবাস্তব ও অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। 'সীতা' নাটকে সীতার চরিত্রে আধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি, রামচরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেম-চেতনার দ্বন্দ্ব এবং বশিষ্ঠের চরিত্রে ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের ছবি রয়েছে। শূদ্রের অধিকারবোধ এবং ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সঙ্গে সংঘাতের চিত্র এঁকেছেন শূদ্রক-হত্যা প্রসঙ্গে। 'ভীষ্ম' নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে সহজ হৃদয়বৃত্তির। দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তব্য ও চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবনসত্যের খোঁজ করেছেন। তাঁর সুস্পষ্ট জীবনজিজ্ঞাসার এই সব পৌরাণিক প্রসঙ্গ সমকালীন তাৎপর্যে মন্ডিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের মহাভারত আশ্রয়ী নাটক 'ভীষ্ম'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য, ''আমি ভীষ্মের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই। কিম্বা ভীষ্ম সম্বন্ধে মহাভারতের বর্ণিত কাব্যটুকু সঙ্কলন করিতেও বসি নাই। ভীষ্মের জন্মবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ না করিয়া সেইজন্য আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আরম্ভ করিয়াছি এবং কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।' তাঁর এই বিশুদ্ধ কল্পনা মহাভারতীয় আখ্যানের প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেছেন, 'পুরাণবহির্ভূত কল্পিত অংশটুকু অনেক ক্ষেত্রেই মূল বিষয়বস্তুর মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই।''[২৮]

মহাভারতের আখ্যানে ভীষ্মের সুদীর্ঘ আয়ু প্রায় চারটি জেনারেশন ব্যাপী বিস্তৃত। ফলে ভীষ্মের সমগ্র জীবন কাহিনি নিয়ে নাটক রচনার ক্ষেত্রে সময়ের ঐক্য রক্ষা সব দিক থেকে সম্ভব হয়নি। বস্তুত একটি নাটকের মধ্যে ভীষ্মের জীবনকে তুলে ধরার প্রয়াস যেকোনো নাট্যকারের পক্ষেই কষ্টকর।

ভীষ্ম (১৯১৪) :

নাটকের শুরুতেই ভীষ্মকে দেখা যাচ্ছে ব্যাসদেবের শিষ্য রূপে। ভীষ্মের মধ্যে ত্যাগের মন্ত্র বপন করছেন ব্যাসদেব। মহাভারতে ব্যাসদেবেকে দেখা যায় আরো অনেক পরে, যখন কৌরব বংশ প্রায় বিলুপ্তির পথে তখন ব্যাসদেব আহুত হয়েছিলেন অম্বিকা অম্বালিকার গর্ভে ক্ষেত্রজপুত্র উৎপাদনের লক্ষে। নাট্যকার সত্যবতীকে করেছেন অনন্তযৌবনা, তাই দেখা যায় কুরুযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এ সম্বন্ধে সুন্দর একটি টিপ্পনী কেটেছেন, ''সত্যবতী ঋষির নিকট হইতে অনন্ত যৌবন বর চাহিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু অনন্ত আয়ু লন নাই।''[২৯]

ভীষ্মের সঙ্গে অম্বার পূর্ব প্রণয় কাহিনি নাট্যকারেরর মৌলিক ভাবনা। অম্বা ও ভীষ্মকে নিয়ে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তারই সুযোগে নাট্যকার অম্বাকে তার নর্ম্ম সহচরী করে দেখিয়েছেন। কিন্তু দাশরাজের কাছে ব্রহ্মচর্যের ব্রত অঙ্গীকারে তার প্রেমিকা রূপান্তরিত হয়েছে 'ভগিনি'তে। এমন কি শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে মাতৃ সম্মোধনের মধ্য দিয়ে ভীষ্ম নিজেকে অম্বার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে অম্বার তীব্র প্রতিবাদ- 'উচ্চারণে এমন কি মোহ আছে, যাহা শক্তিবলে সত্যকে বিলুপ্ত করে?'(৩/৬)

মহারাজ শান্তনুর প্রতি সত্যবতীর বীতস্পৃহার কথা নাটকে শোনা যায়। তাদের সম্পর্কের চালচিত্র এক নতুন সংকট নিয়ে এসেছে। নারী স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সত্যবতী নেমেছেন স্বেচ্ছাচারীতায়। কী তীব্র তার উচ্চারণ –

'যার প্রতি কর তুমি কাম দৃষ্টিপাত,
তোমারে তাহার ভালবাসিতে হইবে,
. . . . . যেন রমণীর
নাহিক হৃদয়, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি স্বাধীন;
যেন নারী কৃতদাসী চরণে তোমার।'(২/১)

সত্যবতীর ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে স্বাধীনতা দিতে গিয়ে নাট্যকার শাল্বকে টেনে এনেছেন। ফলে এই স্বেচ্ছাচারিতা সত্যবতী চরিত্রকে করেছে কলুষিত। এমনকি শান্তনুর মৃত্যুরপর তার শবদেহ সৎকার হওয়ার আগেই শাল্বের সঙ্গে ব্যাভিচারে মত্ত হয়েছেন এবং তা ভীষ্মের সম্মুখে ধরাও পড়েছে অথচ এই সত্যবতীর কারণে ভীষ্মকে ত্যাগ করতে হয়েছিল অনেক। সত্যবতীর এই আচরণ রসবোধে আঘাত করে, তা অ-মহাভারতীয় বলে নয়। আবার মহারাজ শান্তনুর কী সাংঘাতিক অভিব্যাক্তি, 'কি ভীষণ স্নেহহীন সুন্দরী রমণী!'(২/১) এমন কি এই বিস্ময় শান্তনুকে তার পুত্রদের সম্পর্কে কি নিদারুণ সম্ভাবনার কথা ভাবিয়েছে, 'ইহারা কি আমার সন্তান?'(২/১)

গান্ধর্বরাজের সঙ্গে হস্তিনার রাজকুমার চিত্রাঙ্গদের যুদ্ধের প্রারম্ভে চিত্রাঙ্গদ যখন মাতা সত্যবতীর সতীত্বের আস্ফালন করেন তা যেন বিদ্রুপের মতো শোনায়।

'আমি যদি সতী হই, পুত্র চিত্রাঙ্গদ,
ফিরে এসো যুদ্ধ হতে রণজয়ী তুমি।'(২/৭)

নাটকে সত্যবতীকে যে রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে তার মুখে এই উচ্চারণ শোভা পায় না। গান্ধারীর দুর্যোধনকে আশীর্বাদ করার মতো এখানে ফাঁক রয়ে গেছে। তাই চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হলো। বিদূষক মাধব চিত্রঙ্গদের মৃত্যুর জন্য সত্যবতীকে দায়ী করেছেন। ''চিত্রাঙ্গদ রাজ্যশাসনের কোনও ক্ষেত্রে মহামতি ভীষ্মের পরামর্শ নিয়ে চলতেন না। . . . বিচিত্রবীর্য তাঁর পিতৃকল্প বড় ভাই ভীষ্মকে মেনে চলেন। রাজ্যের আইনকানুন শৃঙ্খলা তথা পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে মহামতি ভীষ্মের মূল্যবান পরামর্শগুলি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতেন।''[৩০] নাটকে বিচিত্রবীর্য নিজের ব্যাক্তিত্বকে প্রকাশ করতে না পারায় বিচিত্রবীর্য্য সংকুচিত। ভীষ্মের হরণকৃত কাশীরাজকন্যাদ্বয়কে বিচিত্রবীর্য্যের পছন্দ হয় না। হস্থিনাধিপতির মাতা ধীবরনন্দিনী বলে কাশীরাজের আয়োজিত স্বয়ংবর সভায় অনিমন্ত্রিত -এই সম্ভাবনার কথা নাটকের প্রেক্ষিতে সত্যবতী চরিত্রকে আরো ছোট করে দেয়।

ভীষ্মের সঙ্গে সত্যবতীর বিরোধকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নাটকে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ সম্পর্কে সত্যবতী জানতেন না বলে উল্লেখিত। সত্যবতী আরো জানতেন না যে তিনি ব্যাসের জননী-

‘এই ধীবরের কন্যা, এই অভাগিনী
শান্তনুর বিধবা মহিষী, এই নারী
দেশপূজ্য ঋষিবর ব্যাসের জননী?’(৪/৫)

ব্যাসের কাছে সত্যবতীর কি আর্তি, যেন তাকে ঘৃণা না করে পুত্র ব্যাসদেব। সত্যবতী সংকুচিত। সত্যবতীকে পাপী বলা হচ্ছে আবার সেই পাপকে ব্যাসের পুণ্যের জোরে শুদ্ধ করা হয়েছে, গঙ্গাও আসেন তাকে শুদ্ধ করতে। মহাভারত সত্যবতীকে পাপী আখ্যা দেয় নি, তাই শুদ্ধির প্রসঙ্গও আসেনি। ব্যঙ্গ করেছেন ভীষ্ম- ‘পাপিনীর পদতলে ঋষি দ্বৈপায়ন!’(৪/৫) এইখানে ভীষ্মের সঙ্গে ব্যাসের একটু তর্ক আছে। পরশুরাম কুলটা মাতার শিরচ্ছেদ করেছিলেন বলে উল্লেখ করলে ব্যাসের ব্যাখ্যা, স্বধর্ম ছেড়ে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রচর্চা করে সে আর ব্রাহ্মণ নয়, তাই -

‘ভার্গবের পরাজয় রাঘবের কাছে।
ব্রাহ্মণের পরাজয় ক্ষত্রিয়ের কাছে।
ভগবান্ পরাজিত মনুষ্যের কাছে।’(৪/৫)

ভীষ্মকে নিয়ে রঙ্গতামাসা করার দুঃসাহস অম্বিকা অম্বালিকার ছিলনা কিন্তু নাটকে এই ভগ্নীদ্বয় ভীষ্মকে চন্দ্রকান্ত বানিয়েছে। ভীষ্মকে ভূপতিত করে পদাঘাত করার স্পর্ধা শাল্বের বিন্দুমাত্র ছিল না, নাটকে তাই হলো আর আহত হলো মহাভারতীয় সেন্টিমেন্ট। অথচ এই ভীষ্ম ভার্গব পরশুরামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করবেন। ব্রাহ্মণ এবং শেষ পর্যন্ত ধীবর রাজের সহায়তায় ভীষ্মকে প্রাণ বাঁচাতে হলো, -এ এক প্রহসন! অথচ দাশরাজের যে ব্যাক্তিত্ব এবং সামর্থ নাটকে অঙ্কিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য পুরুষোচিত নয়। এমনকি দাশরাজকে দিয়ে শাল্বকে পদাঘাত করালেন এবং তার বুকে উপর বসে বর্শা বিদ্ধ করতে উদ্যত হলেন অথচ তার নিজের তীরের আঘাতে তার মন্ত্রীর মৃত্যু ঘটে! দাশরাজকে কাশী রাজকন্যাদের স্বয়ংবর সভায়

পাণিপ্রর্থী রূপে উপস্থিত করার মধ্যে কৌতুক ফুটে উঠে। আবার ক্ষত্রিয় নিচু জাতির কন্যা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু নিচু জাতিয় কাউকে কন্যা দান করতে পারে না - এই রীতিকে কুপ্রথা বলে দাশরাজের কণ্ঠে সমালোচিত হয়েছে। দাশরাজ, দাশরাজ্ঞী, মন্ত্রী -চরিত্রগুলি স্থূলহাস্য রসের জন্য রচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করেছে।

ভীষ্ম কাশীরাজকন্যাদ্বয়কে জোরপূর্বক নিতে চেয়েছে কিন্তু অম্বার হাত কেন ধরলেন নাটকে তার ব্যাখ্যা রূপে বলা হয়েছে 'চিনি নাই -স্বয়ংবর সভা কোলাহলে।' তাই অম্বা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করেছে। সে যেতে চেয়েছে শাল্বের কাছে, কেননা -'ভাবিয়াছ, যুবরাজ, এ ধরণী তলে/ তুমি একা যোগ্যপাত্র ভালোবাসিবার?' অর্থাৎ সে জেদ করে শাল্বের কাছে যেতে চেয়েছে আর ভীষ্ম সাবধান করেছেন, ' বেছে নাও তুমি পতি অন্যজনে।' মহাভারতীয় আখ্যানের ছকটি এখানে সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন নাট্যকার। মূল আখ্যানে যেখানে শাল্ব ছিল অম্বার পূর্ব প্রণয়ী সেখানে ভীষ্ম অম্বাকে কোনো বাধাও দেননি। এখানে অম্বাকেই ভীষ্মের 'নর্ম্মসহচরী' রূপে দেখানো হয়েছে, যা কি না ভীষ্মের আজন্ম ব্রহ্মচর্যের ভিত নড়িয়ে দেয়। মহাভারতে যখনই ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন তখনই তার চরিত্র স্থির হয়ে গেছে যে সেখানে সন্ধেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, কিন্তু নাট্যকার ভীষ্মের মনের ভেতরের আন্দোলন দেখাতে চান -

'দাঁড়ায়ে মানসক্ষেত্রে, নিজ প্রবৃত্তির
সঙ্গে যুদ্ধ করা, তারে করা পরাজয়
মনুষ্যের প্রকৃত শৌর্যের পরিচয়।' (৩/৪)

ভীষ্মের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত অমিত চক্রবর্তীর কবিতায় তা অসাধারণ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে-

''সেদিন সত্যের নামে সত্যতর উপেক্ষা করেছি
রক্তের গভীরে গুপ্ত প্রাণের পিপাসা
শরীরে অধিষ্ঠ ধ্রুব সত্যকে নির্মম
অবজ্ঞা করেছি হায় আগ্রহবিহীন''[৩১]

অম্বার ব্যাক্তিগত প্রতিহিংসার সঙ্গে নির্যাতিত নারী সমাজের প্রতিনিধিত্বের সুর মিশেছে, 'পুরুষ কি ভাবে তার সব অবিচার/ সব অত্যাচার নারী সহিবে নিরবে/ মাথা হেঁট করি?'(৪/৬) আর শিবও পুরুষের পক্ষপাত দেখিয়েছেন। নতুন বিতর্ক তুলেছেন শিব, 'ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত। তাহারে বিনাশ/ অসম্ভব যদি তার ইচ্ছা নাহি হয়।'(৪/৬) পুরুষের হন্তারূপে নারীকে কল্পনা করতে পারেননি বলে অম্বার নারীজন্মের রূপান্তর ঘটাতে হলো শিখন্ডী রূপে। বঙ্কিমচন্দ্র শিখন্ডীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, ''মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের কবি, কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশূন্য, নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখন্ডীসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন।''[৩২]

নাটকে ভীষ্মের ব্রহ্মচর্যের প্রতি অম্বার তীব্র কটাক্ষ নাটকে ব্যাক্ত হয়েছে -

অম্বা : কিন্তু তুমি নহ ব্রহ্মচারী। কেন মিথ্যা বল, দেবব্রত? কামজয় করিয়াছ তুমি, দেবব্রত?

ভীষ্ম : না, না! আমি নহি কামজয়ী। তাই ডরি আপনারে, তাই ডরি রমণীরে।

অম্বার ব্যক্তিগত ক্ষোভের সঙ্গে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কথাও জুড়ে যায়। সে শাল্বকেও ক্ষমা করেনি, ছুড়ির আঘাত করেছে। পরশুরামের কাছে তার আর্তি -

'টলাইব ভীষ্মের এ প্রতিজ্ঞা; নিষ্ফল
করিব জীবনব্যাপী তাহার সাধনা;
ভাঙ্গিব তাহার ব্রত; তাহার অহংকার
করিব বিচূর্ণ আজি; ছিন্ন করি তার
ছদ্মবেশ, দেখাইব নগ্ন দেবব্রতে'(৪/১)

তার এই বিধ্বংসীরূপের সামনে নাট্যকার ভীষ্মকে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নিয়ে এসেছেন। ফলে ধরা পড়ে ভীষ্মের দুর্বলতা- 'আমার এ রক্তে যদি তৃপ্ত হয় নারী/ তাহা যেন হাসি মুখে ঢেলে দিতে পারি।'(৪/৬)

চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাবলীর দুই প্রজন্ম পর পঞ্চম অঙ্কের সূত্রপাত ঘটেছে, মঞ্চে এসেছেন কৃষ্ণ। শকুনি যে সমগ্র কৌরব গোষ্ঠীর ধ্বংসই চান তা তার প্রহেলিকা পূর্ণ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সুবলপুত্র তাঁর মনের প্রচ্ছন্ন ক্ষোভকে আবৃত করতে চেয়েছেন। 'এ যুদ্ধে কৌরবকুলব হইবে নির্মূল।'

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অম্বিকা-অম্বালিকা এবং সত্যবতীকে দেখা গেল অথচ মহাভারত কাহিনীতে এরা বিদায় নিয়েছেন অনেক আগেই যখন সদ্যপতিহীন কুন্তী পঞ্চপাণ্ডবকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনায় এসেছেন। এত দীর্ঘ দিন তাদের বেঁচে থাকারও কথা নয়। পৃথিবী এখন বিগতযৌবনা বলে স্বয়ং ব্যাসদেব মাতা সত্যবতী ও অম্বিকা-অম্বালিকাকে সরিয়ে নিয়েছেন। তারপর আর তাদের কোনো সংবাদ মহাভারতকার দেননি। নাটকে এই দুই কৌরববধুর মনে হয়েছে, 'আমাদের কাছে পৃথিবী সেই চিরনূতন, জীবন এখনও এক মধুময় স্বপ্ন।'(৫/২) কৌরব বা পাণ্ডব বা উভয় পক্ষের জয়-পরাজয়ে তাদের কিচ্ছু এসে যায় না। এরা অন্তরে চিরযৌবনা, আর সত্যবতীর বাহ্যিক চিরযৌবন এর বিপরীতে সৃষ্ট। অন্তরে বার্ধক্য নিয়ে সত্যবতী তার রূপকে আর সহ্য করতে পারছেন না তাই তিনি বর ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন ঋষিবরকে, 'শেষ কর রূপের এ ব্যঙ্গ অভিনয়।'(৫/২)

নাটকে কুন্তী আর গান্ধারী যুদ্ধের নবম দিনে ভীষ্মের কাছে সুপারিশ করতে গেছেন -

গান্ধারী : এ সাম্রাজ্য দুর্যোধনের নয়, দুর্যোধনের পিতার নয়, এ সাম্রাজ্য ভীষ্মের।

কুন্তী : ভীষ্ম বড় রাজভক্ত! কর্ত্তব্যের জন্য মাতা পুত্রকে ত্যাগ কর্ত্তে পারে, ভীষ্মদেব রাজাকে ত্যাগ কর্ত্তে পারেন না।

ভীষ্মকে কুর্ণিশ করার জন্য সত্যবতী ও দুইপুত্রবধুকে মঞ্চে নিয়ে এলেন। ভীষ্মের পতনে অম্বিকা অম্বালিকা কাঁদলেন, অন্ধ স্থবিরা হয়ে গেলেন সত্যবতী। 'সে আমায় একদিন মা বলে ডেকে ছিল।' ভীষ্মের পতনে সত্যবতী বিলাপ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ভীষ্মের জীবনকে কেন্দ্র করে একাধিক নাটক লেখা হয়েছে। মহাভারতের ভীষ্ম বীর এবং মহৎ। অতুলকৃষ্ণ 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকে ভীষ্ম চরিত্রে এই দ্বৈতগুণের প্রকাশে সক্ষম হননি। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকের কাহিনির বিস্তৃতি সুবিশাল। তিনি সুদূর অতীত থেকে নাট্য কাহিনির সূত্রপাত করেছেন এবং তার ফলে নাটকটি একদিকে হয়েছে ঘটনা-ভারাক্রান্ত, অন্যদিকে কাহিনিতে এসেছে অসংলগ্নতা। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তাদের ভীষ্ম নাটকে কাহিনি-বয়নের ক্ষেত্রে একই ত্রুটির শিকার হয়েছেন। বস্তুত, ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবনকাহিনি একটি মাত্র নাটকে গ্রথিত করা সম্ভব নয়। হয়ত এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্র সতর্ক ছিলেন বলেই তিনি ভীষ্ম কেন্দ্রিক কোন নাটক লেখেন নি। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য -

> ''ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবনকালের পরিবর্তে তাঁহার জীবনের বিশেষ কোন অংশ অবলম্বন করিয়া যদি ইহা রচিত হইত, তাহা হইলে ইহা রসঘন হইতে পারিত। ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবনকালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান রহিয়াছে, কিংবা তিনি তাহার সুদীর্ঘ জীবনের কোনও কোনও অংশে যে সকল বিভিন্নমুখী চরিত্রের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া একাধিক নাটক রচিত হইবার যোগ্য। নাট্যকার তাহা বুঝিতে পরেন নাই।''[৩৩]

ভীষ্ম নাটকের চরিত্রগুলি মহাভারতের আখ্যান থেকে সরে এসে যে যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করেছে আলোচ্য নাটক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তা সকল ক্ষেত্রে সঙ্গতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, ''দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার সময় ভাববাদের রাশটিকে যথটুকু আলগা করেছিলেন পৌরাণিক নাটক রচনার সময় সেটুকু করলেই চলত।''[৩৪] তাঁর নাটক যতটা অ-মহাভারতীয় ততটা ট্র্যাজিক হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল ভীষ্মকে পদাঘাত করেছেন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক', পৃ: ১৫৭, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ' তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১,

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), পৃ: ২৩৫, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ঐ, পৃ: ২৫১, ঐ

৪. 'অনুসন্ধান', সেপ্টেম্বর, ১৯০০

৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত' পৃ: ৭৩৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত' পৃ: ১১০৪, ঐ

৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খণ্ড), পৃ: ১১৮৬, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ২৬৪, ঐ

৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ১৩৩, ঐ

১০. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত' পৃ:১০৯৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১১. রোহিণীনন্দন সরকার (অনু.) : 'জৈমিনি ভারত', পৃ:১৯০, পাতাবাহার সংস্করণ-১৪১৮

১২. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত' পৃ:১১০৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ৬৫৮, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৬৫৯, ঐ

১৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৫৩৪-৫৩৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৬. পিনাকেশ সরকার (সম্পা.) : 'হারানো দিনের নাটক', ভূমিকা অংশ, পৃ:২৬, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯

১৭. পিনাকেশ সরকার (সম্পা.) : ঐ, পৃ: ২৭, ঐ

১৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত' পৃ:১০৩৮, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৯. বাসবী রায় (সম্পা.) : 'ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকসমগ্র' (১ম খণ্ড) ভূমিকা অংশ, পৃ : ২১, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৮

২০. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ:১১০৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

২১. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খণ্ড), পৃ: ১১৮৯, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২২. সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায় : 'এবংআমরা' - মহুয়া ভট্টাচার্য (সম্পা) পৃ: ৩৪৩, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৫

২৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৫৭, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২৪. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৮৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

২৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ১৫৭, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৩৪১, (সভাপর্ব), ঐ

২৭. রথীন্দ্রনাথ রায় : 'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার', পৃ : ২৩১, প্রকাশ ভবন, ৫ম মুদ্রণ, ১৪১৯

২৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), পৃ: ২৭৮, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ঐ

৩০. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ' ,পৃ: ৮৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১১

৩১. অমিত চক্রবর্তী : 'ভীষ্ম দেবব্রত', দেশ, ১৭অক্টোবর, ২০১০

৩২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বঙ্কিম রচনাবলী' (২য় খণ্ড),'কৃষ্ণচরিত্র', পৃ: ৪৩২, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯

৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), পৃ: ২৭৮, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ,২০০৯

৩৪. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক', পৃ: ১৫১, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ' তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১,

উপসংহার :

১৮৫২ থেকে শুরু করে ১৯১২ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬০ বছরের মহাভারত আশ্রয়ী বাংলা নাটকগুলি পৌরাণিক নাটকের ধারাকে পুষ্ট করেছে। মহাভারতীয় চরিত্রের নির্মাণে প্রথম দিকের নাট্যকাররা অনুকরণের সরল পথ অবলম্বন করলেও পরবর্তী কালের নাট্যকাররা পুরাণ কাহিনিকে অতিক্রমের স্পর্ধা দেখিয়েছেন। আবার প্রচলিত কাহিনিকে অক্ষুন্ন রেখে নতুন ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। বহু চর্চিত মহাভারতীয় আখ্যান যুগেযুগে মঞ্চে উঠে এসে তার বিবর্তন ধর্মীতাকে অক্ষুন্ন রেখেছে।

তারাচরণ শীকদার প্রথম প্রয়াসেই সংস্কৃত নাটকের খোলস পরিত্যাগ করে ইংরেজি নাটকের কাঠামো অবলম্বন করেছেন। আখ্যানকাব্যের যুগের প্রভাবে ঘটনার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে চরিত্রের বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। মহাভারতের আখ্যানকে তিনি সরল ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নায়ক-নায়িকার প্রণয় দৃশ্যে বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি।

হরচন্দ্র ঘোষ নাট্যরচনার জন্য মহাভারতীয় যে আখ্যান নির্বাচন করেছেন তাকে নাট্যরূপ দানের প্রতিভা তাঁর ছিল না। তিনি মহাভারতকে নীতিগ্রন্থ হিসেবে দেখেছেন বলেই তাঁর রচনা নাট্যগুণ বিবর্জিত হয়েছে। সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষার দীর্ঘ বক্তব্য নাট্যসংলাপের উপযুক্ত নয় বলে তাঁর নাটক চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। নাটকটিকে তিনি পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা দিতে গিয়ে প্রমাদ ঘটিয়েছেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সংস্কৃত নাটকের চরিত্রগুলিকে অপেক্ষাকৃত সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও বাস্তবরস সঞ্চারে সফল হয়েছেন। নাটুকে রামনারায়ণ রসিক নারদকে এনে হাস্যরস স্ফুরণে সরসতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকে শ্রীকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত ভগবান বলে ঘোষিত হলেও প্রথম দিকে তিনি যেন কেষ্ট ঠাকুর।

মহাকাব্যের নৈব্যক্তিক দূরত্ব ঘুচিয়ে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন মধুসূদন দত্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রভাবেই তিনি যে নাটক রচনা করেছেন সেখানে মহাকাব্যিক চরিত্র দেবযানী আধুনিক নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃত রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যে সমাধান তিনি খুঁজে পান নি, মহাকাব্যের আশ্রয়ে তা সান্তনা পেয়েছে। পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যে আধুনিক জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার রূপকার মধুসূদন দত্ত।

মধ্যপন্থী মনোমোহন বসু বাংলা নাটকে দেশীয় যাত্রার আঙ্গিককে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। নাটকে গানের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর যুক্তির প্রতিফলন নাটকগুলিতে যথেষ্ঠ পরিমানে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালিয়ানার ছাপ রয়েছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অপেক্ষা মানবিক গুণাবলীর প্রতিই নাট্যকারের আগ্রহ।

গিরিশচন্দ্রের মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কেবল ভক্তিরস সঞ্চার এই নাটকগুলির উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই পুরাণ কাহিনির নেপথ্যে নাট্যকারের একটি বার্তা রয়েছে। আত্মপরিচয়ের সংকট, সৃষ্টি-ধ্বংসের দ্বন্দ্ব, সময় তত্ত্ব, নারী ললুপতা, ধনতন্ত্রের অবক্ষয় বা যুদ্ধোন্মাদনা -এ সকল বিষয় নাটকগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে।

রাজকৃষ্ণ রায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় দুজনেই গিরিশনাট্যবলয়ের মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। মূলত পদ্য সংলাপে নাটক রচনা করতে গিয়ে গৈরিশছন্দের অক্ষম অনুকরণ করেছেন। কাশীরামের কাহিনিকে এঁরা সরাসরি গ্রহণ করেছেন। এঁদের নাটকে দৈব দুর্বিপাক রয়েছে কিন্তু নাট্যচরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই।

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির মধ্যে হৃদয়-সৌন্দর্য দান করেছেন। তিনি মহাভারত কাহিনির কাঠামো মাত্র গ্রহণ করেছেন। মানব হৃদয়ের বিশেষ অনুভূতিগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে

কবির কলমে। কর্ণ, কুন্তী, কচ বা চিত্রাঙ্গদা একান্ত ভাবেই রাবীন্দ্রিক। তাঁর কাব্যনাটকের মধ্যে মর্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। মহাভারত আশ্রয়ী নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথ অন্যতম সংযোজন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকের চরিত্র অতিমাত্রায় আদর্শায়িত। তাঁর নাটকে অলৌকিকতার যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক কাহিনির ছক তিনি হুবহু অনুসরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্র যেভাবে ভক্তিবাদকে নাটকের মধ্যে আত্তীকরণ করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের সে ক্ষমতা ছিল না। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতা প্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মূল কাহিনিকে প্রায় মানেনই নি। তিনি ভীষ্মকে অবমাননা করেছেন কিন্তু ভীষ্ম চরিত্রের মধ্যে যে ট্র্যাজিক সম্ভাবনা ছিল তা তিনি অঙ্কন করতে পারেন নি। তবে নারী চরিত্রগুলির প্রতি নাট্যকারের সমবেদনা লক্ষণীয়।

আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে এসকল নাটকগুলিকে বিচার করলে সঠিক মূল্যায়ন করা হবে না। উনিশ শতকে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব বাঙালির পরিমণ্ডলে যে আধ্যাত্মিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল তা নাট্যজগৎকে আলোড়িত করেছিল। গিরিশচন্দ্রের মতো প্রবল প্রতিভাবান মানুষ কেন সফল সামাজিক নাটক লিখতে পারেন নি -এদিকটাও ভেবে দেখবার বিষয়। পৌরাণিক নাটক বাঙালি দর্শক দেখেছিল, ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছিল, হাততালি দিয়েছিল -এটাই ঐতিহাসিক সত্য। মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলি পৌরাণিক নাটকের এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। মহাভারত আশ্রয়ী বাংলা নাটকগুলির যে প্রবণতা ও ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেগুলিকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমপর্বের নাটকে ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। নাট্যকাররা কাহিনির অন্বেষণে বা নীতিকথা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে মহাভারতকে অবলম্বন করেছেন। কাহিনির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলে প্রায়ই চরিত্রের বিকাশ ঘটেনি। এই

পর্বের নাটকে কৃষ্ণ ঐশ্বরিক মহিমায় আবির্ভূত হন নি বলে কৃষ্ণকে নিয়ে রসিকতা করা সহজ ছিল। সংস্কৃত নাটকের বহিরঙ্গগত কিছু প্রভাবও দুরদৃষ্ট নয়। বিদূষক চরিত্রটি পরবর্তী কালের নাটকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এপর্বের নাটকে গানের ব্যবহার তুলনামূলক কম এবং অধিকাংশ নাটকই মিলনান্তক।

পরবর্তী পর্যায়ে নাটকে প্রচুর গান যুক্ত হলো। কিছু গান আমোদ-প্রমোদের জন্য এবং কিছু গানে কীর্তনের ভাবাবেগ যুক্ত হলো। পাগল, বৈরাগী, বাতুল -এসকল চরিত্রগুলির আপাত অর্থহীন বক্তব্যের মধ্যে ভক্তিরসের সুর শোনা যায়। বহুবিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রসিক নারদকে অনেক নাটকের অন্যতম চরিত্র রূপে দেখা যায়। দুর্বাশাকেও মাঝে মধ্যে দেখা গেছে পরিহাসের পাত্র রূপে। শকুনিকে কমিক চরিত্র রূপেই নাট্যকাররা গ্রহণ করেছেন। বৃদ্ধ চরিত্রের অর্ধবুদ্ধি সম্পন্ন সংলাপ হাস্যরস সৃজনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। মহা মানী দুর্যোধনকে নির্বোধ বা অতিসরল এবং মহাভারতের বীর অর্জুনকে কামুক রূপে কোন কোন নাটকে উপস্থাপন করেছেন। তুলনায় ভীমকে অনেক নাটকে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়। আবার একই বিষয় নিয়ে একাধিক নাটক রচনাও লক্ষণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালিয়ানার ছাপ পড়েছে। কাশীরামের আখ্যানের বিপুল জনপ্রিয়তাই মহাকাব্যিক দূরত্ব লঙ্ঘন করেছে। বেশির ভাগ নারী চরিত্রগুলি প্রায় মধ্যযুগীয়।

মহাভারতের মূল কাহিনির পাশাপাশি গৌণ কাহিনি নিয়ে রচিত নাটকের সংখ্যাও যথেষ্ঠ। গিরিশচন্দ্র মহাভারত অনুসরণ করে বেশ কিছু নাটক রচনা করলেও অধিকাংশ নাটকের কাহিনিই মূল কাহিনির সঙ্গে গৌণ সম্পর্কে যুক্ত। নাটকের মধ্যে ভক্তিরসকে তিনি যেভাবে আত্মীকরণ করেছেন সমকালীন অন্য কোন নাট্যকারই তা দেখাতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকগুলির তুলনায় মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলিতে তাঁর নিজস্ব দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কাহিনিকে অক্ষুন্ন রেখেও নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী কালের নাট্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ মহাভারতের কাহিনিকে লঙ্ঘন করার স্পর্ধা

দেখিয়েছেন। নাটকের কাহিনির থেকে চরিত্রকে নতুন করে নির্মাণই আধুনিক কালের নাট্যকারদের লক্ষ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলা পৌরাণিক নাটকের জন্ম, বিকাশ এবং পরিণতি ঘটে। নতুন শতকে পৌরাণিক নাটকের ভাব-পরিমণ্ডল ঐতিহাসিক কারণেই ব্যহত হয়। অপরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, মন্মথ রায়ের নাটকে পুরাণের প্রসঙ্গ থাকলেও পূর্ববর্তী যুগের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে নি। আধুনিক কালের মনোজ মিত্র, বুদ্ধদেব বসু বা শাঁওলী মিত্রের নাটক মহাভারতের প্রসঙ্গে কিছু নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী যে নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, যে অন্যায় ঘটে গেছে কর্ণের জীবনে, ধর্মযুদ্ধের নামে কুরুক্ষেত্রে যে অন্যায় ঘটে গেছে- সে সকল অন্যায় গুলির প্রতিই আধুনিকের আগ্রহ। প্রাচীনেরা মহাকাব্যের মধ্য থেকে ন্যায় বোধগুলিই দেখাতে চেয়েছিলেন।